একখানা উলতে পড়া চেয়ার

হেমেন্দ্রকুমার রায়

একখানা উলটে পড়া চেয়ার

।। এক।।

সদাশিব মুখোপাধ্যায়। যখন জয়ন্ত ও মানিককে গোয়েন্দা বলে কেউ জানত না, তিনি তখন থেকেকেই তাদের বন্ধু।

জমিদার মানুষ। বাস করেন শিবপুরের গঙ্গার ধারে, মস্ত এক বাড়িতে। জয়ন্ত ও মানিক আজ তার কাছে এসেছে সান্ধ্য ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

তখনও সন্ধ্যার শাঁখ বাজেনি। সদাশিববাবুর সাজানো-গুছানো লম্বা-চওড়া বৈঠকখানায় বসে জয়ন্ত ও মানিক গল্প করছে সকলের সঙ্গে। সকলে মানে, সদাশিববাবু ও তাঁর কয়েকজন প্রতিবেশী বন্ধু। তারা আকৃষ্ট হয়েছেন ভূরিভোজনের লোভে নয়, জয়ন্তের নাম শুনেই! জয়ন্তের মুখে তার কোনও কোনও মামলার কথা শুনবেন, এই তাদের আগ্রহ।

কিন্তু জয়ন্তের আগ্রহ জাগ্রত হচ্ছে না নিজের মুখে নিজের কথা ব্যক্ত করবার জন্যে।

ভদ্রলোকেরা তবু নাছোড়বান্দা। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলী হচ্ছেন আবার তিনকড়িবাবু, তিনি সদাশিববাবুর বাড়ির খুব কাছেই থাকেন। আগে কোনও সরকারি অফিসের কর্মচারী ছিলেন, এখন কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। বয়সে ষাট পার হয়েছেন। বিপত্নীক ও নিঃসন্তান।

অবশেষে অনুরোধ উপরোধের ঠেলায় পড়ে জয়ন্ত বলতে বাধ্য হল: আচ্ছা, তাহলে এমন কোনও কোনও মামলার কথা বলতে পারি, আমি যেগুলো হাতে নিয়ে ব্যর্থ হয়েছি।

তিনকড়িবাবু বললেন, না, না, তাও কি হয়! আমরা আপনাদের সফলতার ইতিহাসই শুনতে চাই। ব্যর্থ মামলা তো অসমাপ্ত গল্প!

জয়ন্ত শেষটা নাচার হয়ে বললে, মানিক, আমাকে রক্ষা করো ভাই! আমি নিজের গুণকীর্তন করতে পারব না কিছুতেই। তুমিই না-হয় ওঁদের দু-একটা মামলার কথা শোনাও।

তাই হল। জয়ন্তের কাহিনি নিয়ে মানিক ঘণ্টা দুই সকলকে মাতিয়ে রাখলে।

তারপর সদাশিববাবু ঘোষণা করলেন, আর নয়, এইবারে খাবার সময় হয়েছে।

আসর ভাঙল।

কিন্তু খেতে বসতে না বসতেই আকাশ বলে ভেঙে পড়ি! বজ্রের হুঙ্কার, ঝড়ের চিৎকার, গঙ্গার হাহাকার! বিদ্যুতের পর বিদ্যুতের অগ্নিবাণের আঘাতে কালো আকাশ যেন খানখান হয়ে গেল। তারপর ঝড় কাবু না হতে হতেই শুরু হল বৃষ্টির পালা। আর সে কি যে সে বৃষ্টি। দেখতে দেখতে মাটির বুক হয়ে গেল জলে জলে জলময়!

সদাশিব বললেন, জয়ন্ত, মানিক! আজ আর বাড়ি যাবার নাম মুখে এনো না। বাড়িতে ফোন করে দাও, আজ এখানেই তোমরা রাত্রিবাস করবে।

জয়ন্ত বললে, তথাস্তু।

।।দুই ।।

সকালে সদাশিব বললেন, যাবার আগে চা পান করে যাও।

মানিক বললে, সাধু প্রস্তাব।

অনতিবিলম্বে চায়ের সঙ্গে এল আরও কিছু কিছু। এবং চায়ের পেয়ালায় দু-একটা চুমুক দিতে না দিতেই হন্তদন্তের মতো ছুটে এসে তিনকড়িবাবু বললেন, আমার সর্বনাশ হয়েছে।

সদাশিব বললেন, ব্যাপার কী তিনকড়িবাবু?

—চোরে আমার বিশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

জয়ন্ত বললে, থানায় খবর পাঠিয়েছেন?

—পাঠিয়েছি। পুলিশ এখনও আসেনি। কিন্তু পুলিশ আসবার আগে আপনাকে আমি চাই।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, আমাকে!

-আজ্ঞে হ্যাঁ পুলিশের চেয়ে আপনার উপরেই আমার বেশি বিশ্বাস।

—আমাকে মাপ করবেন। এ সব সাধারণ চুরির মামলা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই। না। পুলিশ অনায়াসেই এ রকম মামলার কিনারা করতে পারবে।

তিনকড়ি করুণ স্বরে বললেন, সদাশিববাবু, আমার মতন লোকের কাছে এ চুরি সাধারণ চুরি নয়। ওই বিশ হাজার টাকার দাম আমার কাছে কত, আপনি তা জানেন। আপনি দয়া। করে আমার জন্যে জয়ন্তবাবুকে একটু অনুরোধ করেন–

সদাশিব বললেন, বেশ, তা করছি। জয়ন্ত, আমারও ইচ্ছা–

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, আর বলতে হবে না, তোমার ইচ্ছা কী বুঝেছি। কিন্তু নিমন্ত্রণ খেতে এসে চুরির মামলা নিয়ে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। বড়ো জোর তিনকড়িবাবুর মুখে চুরির বিবরণ শুনে ঘটনাস্থলে একবার চোখ বুলিয়ে আসতে পারি। তার বেশি আর কিছু আমি পারব না।

তিনকড়ি আশান্বিত হয়ে বললে, আমার পক্ষে তাই হবে যথেষ্ট।

।। তিন ।।

জয়ন্ত শুধোলে, আপনার টাকাগুলো কোথায় ছিল?

—একতলায়, আমার পড়বার ঘরে বইয়ের আলমারির ভিতরে।

–বলেন কী, অত টাকা রেখে দিয়েছিলেন বইয়ের আলমারির ভিতরে!

–দোতলার ঘরে আমার লোহার সিন্দুক আছে বটে, কিন্তু বছর চারেক আগে একবার চোর এসে সিন্দুক থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছিল, তাই তার ভিতরে আর দামি কিছু রাখতে ভরসা হয় না।

–টাকাগুলো ব্যাংকে জমা রাখেননি কেন?

–তাই তো রেখেছিলুম জয়ন্তবাবু। কিন্তু গেল বছরে ভিতরে ভিতরে খবর পাই, আমার ব্যাংক লাল বাতি জ্বালবার আয়োজন করছে। তাড়াতাড়ি টাকা তুলে আনলুম আর তারই দিন ছয়েক পরে ব্যাংক দরজা বন্ধ করলে, অনেক হতভাগ্যের সর্বনাশ হল। ব্যাপার দেখে আমি এমন নার্ভাস হয়ে গেলুম যে, টাকাগুলো আর কোনও ব্যাংকেই জমা রাখতে পারলুম না।

—আপনার বাড়িতেই যে অত টাকা আছে, এ খবর আর কেউ জানত?

—আমি তো জনপ্রাণীর কাছে ও টাকার কথা বলিনি।

—কিন্তু ব্যাংক থেকে যে আপনি টাকা তুলে এনেছেন এটা তো অনেকেই জানে?

—তা জানে বটে।

—আর নতুন কোনও ব্যাংকে আপনি টাকা জমা রাখেননি, এ খবরটাও তো কেউ কেউ রাখতে পারে?

তাও পারে বটে। কিন্তু চোর কেমন করে জানবে যে এত জায়গা থাকতে আমি বইয়ের আলমারির ভিতরেই অত টাকা লুকিয়ে রেখেছি?

—তিনকড়িবাবু, এ চোর হচ্ছে সন্ধানী। সে কেমন করে আপনার পড়বার ঘরে ঢুকেছে?

–সেটা খালি আমার পড়ার ঘর নয়, আমার বৈঠকখানাও। তার দক্ষিণ দিকে হাতআষ্টেক চওড়া আর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটুখানি জমি আছে, তার পরেই সরকারি রাস্তা। চোর সেই বেড়া টপকে এসেছে। প্রথমে খড়খড়ির পাখি তুলে ফাক দিয়ে আঙুল গলিয়ে জানলা খুলেছে। তারপর কোনও তীক্ষ্ণ অস্ত্র বা বাটালি দিয়ে একটা গরাদের গোড়ার দিককার কাঠ খানিকটা কেটে ফেলে গরাদটাও সরিয়ে ফেলেছে। তারপর ঘরে ঢুকে নিজের চাবি দিয়ে আলমারি খুলে টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। কিন্তু এখনও আমি এই ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছি যে টাকা সে আবিষ্কার করলে কেমন করে?

-কেন?

——টাকাগুলো আমি সাধারণ ভাবে রাখিনি। দপ্তরিকে ফরমাজ দিয়ে আমি ঠিক কেতাবের মতো দেখতে একটি বাক্স তৈরি করিয়ে ছিলুম আর তারই ভিতরে রেখেছিলুম বিশ খানা হাজার টাকার নোট। আলমারির বাইরে থেকে দেখলে বাক্সটাকে সোনার জলে নাম লেখা একখানা সাধারণ বই ছাড়া আর কিছুই মনে করবার উপায় ছিল না।

—পড়বার ঘরই আপনার বৈঠকখানা? সেখানে তাস-দাব-পাশার আসরও বসত?

—তা বসত বই কি, রোজ নয়—শনি-রবিবারে আর ছুটির দিনে।

—সে আসরে নিয়মিত ভাবে অনেকেই আসতেন?

–আমার বন্ধুর সংখ্যা বেশি নয় জয়ন্তবাবু নিয়ামত ভাবে আমাদের বৈঠকে যে ছয় সাত জন

লোক আসেন, চুরির খবর পেয়ে তাঁরা সকলেই আমার বাড়িতে ছুটে এসেছেন, আপনি সেখানে গেলেই তাদের দেখতে পাবেন।

–বেশ, তবে তাই হোক। পুলিশের আগেই আমি ঘটনাস্থলে হাজির হতে চাই।

।। চার ।।

একখানা ছোটোখাটো দোতলা বাড়ি। সামনে অপেক্ষা করছে জনকয়েক কৌতুহলী লোক, জয়ন্ত ও মানিক তাদের মধ্যে কারুকে কারুকে গতকল্য সন্ধ্যায় দেখেছিল সদাশিববাবুর বাড়িতেও।

তিনকড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকে তার পাঠ গৃহের দরজার তালা খুলে ফেললেন।

জয়ন্ত গলা তুলে সকলকে শুনিয়ে বলল, তিনকড়িবাবু, বাইরে এঁদের এইখানেই অপেক্ষা করতে বলুন। আগে আমরা ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা করে দেখি, তারপর অন্য কথা।

মাঝারি আকারের ঘর। মাঝখানে একখানা গালিচা-বিছানো তক্তাপোষ। একদিকে একটি আর একদিকে দুটি বই-ভরা আলমারি এবং ছোটো টেবিল ও দু খানা চেয়ার। আর একদিকেও পুস্তক-পূর্ণ সেলফ। একটি আলমারির সামনে মেঝের উপরে উলটে পড়ে রয়েছে একখানা চেয়ার। ঘরের এখানে-ওখানে যেখানে-সেখানেও ছড়ানো রয়েছে নানা আকারের কেতাব ও মাসিকপত্র প্রভৃতি। দেখলেই বোঝা যায় যে তিনকড়িবাবু হচ্ছেন দস্তুরমতো গ্রন্থকীট।

জয়ন্ত মিনিট দুয়েক ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, তিনকড়িবাবুর টাকা চুরি গিয়েছে কোন আলমারির ভিতর থেকে?

তিনকড়ি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন।

–ওর সামনে একখানা চেয়ার উলটে রয়েছে কেন?

–জানি না। তবে ওটা হচ্ছে চোরেরই কীর্তি। কারণ কাল রাত্রে আমি যখন এ ঘর থেকে দরজা বন্ধ করে যাই, চেয়ারখানা তখন চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল।

–আপনি কাল যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যান চেয়ারখানা তখন কোথায় ছিল?

–ওদিককার টেবিলের সামনে।

–তা হলে চোবই চেয়ারখানা আলমারির সামনে টেনে এনেছে।

–তা ছাড়া আর কী?

জয়ন্ত পকেট থেকে রুপোর ছোট্ট ডিপে বার করে নস্য নিতে নিতে (এটা হচ্ছে তার আনন্দের লক্ষণ–নিশ্চয়ই সে কোনও উল্লেখযোগ্য সূত্র আবিষ্কার করেছে) বললে, বটে বটে, বটে! আপনার সেই জাল কেতাবে পুরে আসল নোটগুলো আলমারির কোন তাকে রেখেছিলেন?

তিনকড়ি থতমত খেয়ে বললেন, জাল কেতাব?

–হ্যাঁ জাল কেতাব। অর্থাৎ যা কেতাবের মতো দেখতে, কিন্তু কেতাব নয়।

–ও বুঝেছি। সেই কেতাব-বাক্সটা ছিল আলমারির সব-উপর তাকে।

–যা ভেবেছি তাই, বলতে বলতে জয়ন্ত আলমারির কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আলমারিটা পরীক্ষা করতে করতে আবার বললে, আলমারির কলে যে চাবিটা লাগানো রয়েছে সেটা কি আপনার?

তিনকড়ি বললেন, আজ্ঞে না। ওটা নিশ্চয়ই চোরের সম্পত্তি।

–তাহলে এ চোর পেশাদার চোর নয়।

–কী করে বুঝলেন?

–পেশাদার চোরের কাছে প্রায়ই চাবির গোছা থাকে, এ রকম একটিমাত্র চাবি থাকে। এখানে চোর এসেছিল একটিমাত্র চাবি নিয়ে। তার মানে সে জানত, এই একটিমাত্র চাবি দিয়েই সে কেল্লা ফতে করতে পারবে। যদি বলেন সে এতটা নিশ্চিত হয়েছিল কেন? তবে তার উত্তর হচ্ছে, সে আন্দে থাকতেই যে-কোনও সুযোগে এই আলমারির কলে একটা মোমের বা অন্য কিছুর ছাঁচ তুলে নিয়ে বিশেষ একটি চাবি গড়ে তবে এখানে এসেছিল। চুরি তার ব্যাবসা নয়, এ চাবি পরে তার কোনও কাজে লাগবে না, তাই চাবিটাকে সে এখানে পরিত্যাগ করেই প্রস্থান করেছে। ...তিনকড়িবাবু, দেখছি ওই জানালাটার একটা গরাদ নেই। চোর কি ঐ খান দিয়েই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছিল?

–আজ্ঞে হ্যাঁ

জয়ন্ত জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর জানালাটা ভালো করে পরীক্ষা করে ফাক দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

মাটির উপরে কিছুক্ষণ হুমড়ি খেয়ে বসে কী পর্যবেক্ষণ করলে। তারপর উঠে বললে, মানিক, কাল রাত্রে কখন বৃষ্টি থেমেছিল তুমি তা জানেনা তো?

মানিক বললে, হ্যা আমি তখনও জেগেছিলুম। বৃষ্টি থেমেছিল রাত দুটোর সময়ে।

–তাহলে এখানে চোরের আবির্ভাব হয়েছে রাত দুটোর পরে।

সদাশিব শুধোলেন, এ কথা কেমন করে জানলেন?

জয়ন্ত বললে, খুব সহজেই। ভিজে মাটির উপরে রয়েছে কয়েকটা স্পষ্ট পায়ের দাগ। নিশ্চয়ই চোরের পদচিহ্ন। কালকের প্রবল বৃষ্টিপাতের ভিতরে চোর এখানে এলে সব পায়ের দাগ ধুয়ে মুছে যেত। হ্যাঁ, পায়ের দাগেও বেশ বিশেষত্ব আছে।

তিনকড়ি সাগ্রহে বললেন, কী বিশেষত্ব?

–যথাসময়ে প্রকাশ্য বলতে বলতে জয়ন্ত আবার জানালার ফাঁক দিয়ে গলে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। তারপর নিম্নস্বরে আবার বললে, তিনকড়িবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

–আজ্ঞা করুন।

–আপনি কি আলমারির ভিতর থেকে কেতাবখানা মাঝে মাঝে বার করতেন?

–আজ্ঞে হ্যাঁ, করতুম। দেখতুম নোটগুলো যথাস্থানে আছে কি না।

–তখন নিশ্চয়ই ঘরের ভিতরে আপনি একলা থাকতেন?

–সে কথা জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য।

জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত নিজের মনে কী ভাবতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর শুধোলে, রাস্তার ওপারে ওই যে লাল রঙের বাড়ি রয়েছে, ওখানা কার বাড়ি?

–যদুবাবুর। আমার এক বিশেষ বন্ধু।

–তার পাশের ওই হলদে বাড়িখানা?

–মাধববাবুর। তিনিও আমার বিশেষ বন্ধু।

–আচ্ছা, অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছি, একটি ছোট্টখাট্ট ভদ্রলোক বারবার দরজার ওপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মারছেন, উনি কে?

তিনকড়ি বললেন, আমিও দেখেছি। ওঁরই নাম যদুবাবু।

যদুবাবুও জয়ন্তের প্রশ্ন শুনতে পেলেন। দরজার সামনে এসে তিনি বললেন, জয়ন্তবাবু, ক্ষমা করবেন। আমি আমার কৌতূহল সংবরণ করতে পারছিলাম না। কে না জানে, আপনি হচ্ছেন এক আশ্চর্য যাদুকর গোয়েন্দা। আজ এখানে এসে আবার কি যাদু সৃষ্টি করেন তাই দেখবার জন্যে আমার আগ্রহের আর সীমা নেই।

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট যে কোনও যাদু সৃষ্টি করবার দরকার নেই। আমার যা জানবার তা জেনেছি। এখন আপনারা সকলেই ঘরের ভিতরে আসতে পারেন।

–তাই নাকি? তাই নাকি? বলতে বলতে ও হাসতে হাসতে সর্বপ্রথমেই ঘরের ভিতরে পদার্পণ করলেন যদুবাবু। ছোট্টখাট্ট বললেই তার চেহারা বর্ণনা করা যায় না, ভগবানের দয়ায় তিনি বামন হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন–কারণ তার দেহের দৈর্ঘ্য সাড়ে চার ফুটের চেয়ে বেশি নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই অনুসারেই মানানসই–যদিও তার দেহখানি ছোটোর ভিতরেই দিব্য নাদুস-নুদুস।

যদুবাবুর পর দেখা দিলেন মাধববাবু, দস্তুরমতো দশাসই চেহারা–উচ্চতাতেও ছয় ফুটের কম হবে না। এলেন আরও জনচারেক ভদ্রলোক।

তিনকড়ি একে একে সকলের সঙ্গে জয়ন্তের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, আমার তাস-দাবা খেলার সাথি হচ্ছেন এঁরাই।

জয়ন্ত মুখে কিছু বললে না, কেবল একবার করে চোখ বুলিয়ে প্রত্যেকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিলে।

মাধববাবু বললেন, বলেন কী জয়ন্তবাবু, ব্যাপারটা এখনই আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে?

—আজ্ঞে। খুব স্পষ্ট।

—কিন্তু আমরা তো স্পষ্ট কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

—এখানে কাল রাতে চুরি হয়ে গিয়েছে।

—তাই তো শুনছি।

—চোর ওই গরাদ খুলে এই ঘরে ঢুকেছে।

—তাই তো দেখছি।

—তাহলে ব্যাপারটা কি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না?

—উহুঁ! চোর কে?

—সেটা পুলিশ এসে আবিষ্কার করবে। আমি এখানে চোর ধরতে আসিনি, আপনাদের মতো মজা দেখতে এসেছি।

যদুবাবু আপত্তি করে বললেন, আমরা এখানে মজা দেখতে আসিনি, বন্ধুর দুঃখে সহানুভূতি জানাতে এসেছি।

মাধববাবু বললেন, আমরা ভেবেছিলুম, আপনি যখন এসেছেন, চোর ধরা পড়তে দেরি লাগবে না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, পুলিশ যদি চোরকে ধরতে পারে তাহলে দেখবেন, চোর আপনার মতো মাথায় ছফুট উঁচু নয়।

মাধববাবু সবিস্ময়ে বললেন, বলেন কী? কেমন করে জানলেন?

—সে কথা বলবার সময় হবে না। ওই পুলিশ এসে পড়েছে।

। পাঁচ ।।

ইনস্পেকটার হরিহরবাবু একজন সহকারীকে নিয়ে গট গট করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। বয়সে প্রৌঢ়, মোটাসোটা দেহ, মুখে উদ্ধত ভাব।

রুক্ষ স্বরে তিনি বললেন, ঘরে এত ভিড় কেন? বাড়ির কর্তা কে?

তিনকড়ি এগিয়ে এসে বললেন, আজ্ঞে আমি।

–আপনারই টাকা চুরি গিয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ

—ওঁরা কে?

—এঁরা আমার বন্ধু। আর উনি হচ্ছেন বিখ্যাত শৌখিন গোয়েন্দা জয়ন্তবাবু।

কৌতুহলী চোখে হরিহর একবার জয়ন্তের মুখের পানে তাকালেন। তারপর বললেন, ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুকে মাঝে মাঝে আপনি কোনও কোনও মামলায় সাহায্য করেন।

জয়ন্ত বিনীত ভাবে বললে, আজ্ঞে, ঠিক সাহায্য করি বলতে পারি না, তবে সাহায্য করবার চেষ্টা করি বটে।

মুখ টিপে হেসে হরিহর বললেন, এখানেও কি সেই চেষ্টা করতে এসেছেন?

—আজ্ঞে না, মশায়ের চেহারা দেখেই বুঝেছি, আপনার কাছে আমার চেষ্টা নগণ্য।

—ঠিক। সুন্দরবাবুর সঙ্গে আমার মত মেলে না। আমার মত হচ্ছে, শখের গোয়েন্দার কাছে পেশাদার গোয়েন্দার শেখবার কিছুই নেই।

জয়ন্ত বললে, আপনার মত অভ্রান্ত। আমিও ওই মত মানি।

হরিহর বললেন, এইবার মামলার বৃত্তান্তটা আমি শুনতে চাই।

তিনকড়ি আবার সব কথা বলে গেলেন একে একে।

হরিহর সব শুনে বললেন, যে তোক এই বাজারে বিশ হাজার টাকা রাখে বৈঠকখানার কেতাবের আলমারিতে, তাকেই আমি অপরাধী বলে মনে করি। এ হচ্ছে চোরকে নিমন্ত্রণ। করা আর খামকা পুলিশের কাজ বাড়ানো।

তিনকড়ি চুপ করে রইলেন কাঁচুমাচু মুখে।

জয়ন্ত বললে, টাকা ছিল ওই আলমারির ভিতরে।

হরিহর বললেন, টাকা যখন লোপাট হয়েছে, তখন আলমারিটা হাতড়ে আর কোনও লাভ হবে না।

—ওই যে চেয়ারখানা আলমারির সামনে উলটে পড়ে রয়েছে, ওখানা ছিল ওই টেবিলের সামনে।

–বসবার জন্যে চোর ওখানা টেনে এনেছিল আর কী!

–হতেও পারে, না হতেও পারে।

—না হতেও পারে কেন?

–চোর চটপট কাজ হাসিল করে সরে পড়তে চায়। সে চেয়ার পেতে বসে বিশ্রাম করে। আর করলেও সে টেবিলের সামনেই গিয়ে বসতে পারত, চেয়ারখানা এত দূরে টেনে আনত না। বিশ্রাম করবার জন্যে এখানে ঢালা বিছানাও রয়েছে, তবে চেয়ার নিয়ে টানাটানি কেন?

হরিহর ঠাট্টার সুরে বললেন, কেন? তার জবাব আপনিই দিন না!

—আপনি না পারলে পরে আমাকেই জবাব দিতে হবে বই কি!

হরিহর মুখ ভার করে বললেন, আপনার জবাব শোনবার জন্যে আমার কোনোই আগ্রহ নেই। তিনকড়িবাবু, আলমারির কলে একটা চাবি লাগানো রয়েছে দেখছি।

—ও চাবি আমার নয়।

—চোরের?

-সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—চাবিটা নতুন।

—আলমারিটা খোলবার জন্যে চোর হয়তো এই চাবিটা গড়িয়েছিল।

—তাহলে সে আগে এখানে এসে লুকিয়ে কলের ছাঁচ তুলে নিয়ে গিয়েছে।

—তাই তো জয়ন্তবাবু বললেন, এ কোনও সন্ধানী চোরের কাজ।

-জয়ন্তবাবু না বললেও এটুকু আমি বুঝতে পারতুম। তিনকড়িবাবু, আপনার বাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে কে আছে?

—আমার স্ত্রী। আমার ছেলে নেই, কেবল একটি বিবাহিত মেয়ে আছে। সে শ্বশুরবাড়িতে। এখানে একজন রাত-দিনের চাকর আছে। বামুন আর ঝি ঠিকে।

হরিহর ফিরে নিজের সহকারীকে বললেন, সুশীল, বামুন আর চাকরকে সেপাইদের হেপাজতে রেখে এসো।

তিনকড়ি বললেন, আপনি কি তাদের সন্দেহ করছেন? তারা যে খুব বিশ্বাসী।

হরিহর ধমক দিয়ে বললেন, আরে রাখুন মশাই! জানেন তো সব! এরকম বেশির ভাগ চুরির জন্যেই দায়ী গৃহস্থের বামুন-চাকররা। যাও সুশীল।

জয়ন্ত বললে, চোর ওই গরাদ খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকেছে।

হরিহর উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। খোলা গরাদটা হাতে করে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে বললেন, এর মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নেই।

-না। কিন্তু জানালার বাইরে কর্দমাক্ত জমির উপরে চোরের পায়ের ছাপ আছে। -বটে, বটে! সেগুলো তো দেখতে হয়!

—গরাদ-খোলা জানালার ফাক দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে ছাপগুলো আমি দেখে এসেছি। কিন্তু আপনি কি তা পারবেন?

প্রবল মস্তকান্দোলন করে হরিহর বললেন, মোটেই নয়, মোটেই নয়। ওইটুকু ফাক দিয়ে কিছুতেই আমার গতর গলবে না। আমার দেহ গলবার জন্যে দরকার একটা গোটা দরজার ফক। তিনকড়িবাবু, ওই জমিতে যাবার অন্য পথ আছে তো?

আছে। আসুন। এই বলে তিনকড়ি অগ্রবর্তী হলেন।

যদুবাবু চুপিচুপি বললেন, জয়ন্তবাবু, একটা আরজি জানাতে পারি?

জয়ন্ত বললে, নিশ্চয় পারেন।

—আমি গোয়েন্দার গল্প পড়তে ভারী ভালোবাসি। কিন্তু সত্যিকার গোয়েন্দারা কেমন করে কাজ করেন তা কখনও দেখিনি। শুনেছি, পায়ের ছাপ দেখে গোয়েন্দারা অনেক কথাই বলতে পারেন। আপনাদের কাজ দেখবার জন্যে আমার বড়ো আগ্রহ হচ্ছে।

বেশ তো, আসুন না। মাধববাবু বললেন, আমাদেরও আগ্রহ কম নয়। আমরাও যেতে পারি কি? জয়ন্ত বললে, আপনারা সবাই আসুন।

।।ছয় ।।

ছোটো একফালি জমি—লম্বায় পঁচিশ হাত, চওড়ায় আট হাত। দক্ষিণ দিকে বাঁশের বেড়া, তারপর রাজপথ।

হরিহরের আগেই জয়ন্ত সেই জমির উপরে গিয়ে দাঁড়াল—তার পিছনে পিছনে যদুবাবু এবং আর সবাই।

জমির সব জায়গাই তখনও ভিজে রয়েছে। জয়ন্ত বললে, যদুবাবু, আমার পাশে পাশে আসুন। মাটির উপরে সাবধানে পা ফেলুন, চোরের পায়ের ছাপ মাড়িয়ে ফেললে হরিহরবাবু মহা খাপ্পা হয়ে উঠবেন।

তারা তিনকড়িবাবুর বৈঠকখানার গরাদে খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে জয়ন্ত বললে, মাটির উপরে ওই দেখুন চোরের পায়ের ছাপ। বেশ বোঝা যায়, সে বাঁশের বেড়া টপকে যেদিক থেকে এসেছে, আবার চলে গিয়েছে সেই দিকেই।

যদুবাবু বললেন, চোরটা কী বোকা! এতবড় একটা সূত্র পিছনে রেখে গিয়েছে।

জয়ন্ত হেসে বললে, চোরটা হচ্ছে কাঁচা, নইলে সে সাবধান হত।

এমন সময়ে তিনকড়ি প্রভৃতিকে নিয়ে হরিহর এসে পড়লেন। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পায়ের ছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনকড়ি বললেন, জুতো- পরা পায়ের ছাপ। হরিহরবাবু, আমার বামুন আর চাকর জুতো পরে না।

হরিহর বললেন, হয়তো বাইরের চোরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে। রুলের গুঁতো খেলেই পেটের কথা বেরিয়ে পড়বে।

জয়ন্ত বললে, হরিহরবাবু, পায়ের ছাপগুলো দেখে কী বুঝলেন?

—যা বোঝবার তা বুঝেছি। আপনাকে বলব কেন?

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, বেশ আপনি কী বুঝেছেন জানতে চাই না। কিন্তু আমি যা বুঝেছি, বলব কি?

হরিহর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, বলতে ইচ্ছা করেন, বলতে পারেন। আমার শোনবার আগ্রহ নেই।

জয়ন্ত বললে, প্রত্যেক পায়ের দাগের মাঝখানকার ব্যবধানটা লক্ষ করুন। এটা আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া বাহুল্য যে, ঢ্যাঙা লোক পা ফেলে বেশি তফাতে তফাতে আর খাটো লোক পা ফেলে কম তফাতে তফাতে। এখানে পায়ের দাগের ব্যবধান দেখে কী মনে হয়?

হরিহর মাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, এগুলো নিশ্চয় কোনও ছোটো ছেলে—অর্থাৎ বালকের পায়ের ছাপ।

—ধরলুম তাই। এইবারে তিনকড়িবাবুর বৈঠকখানার দৃশ্যের কথা ভেবে দেখুন। তার নোটগুলো ছিল আলমারির উপর তাকে। মাথায় ছোটো চোরের হাত উঁচুতে পৌছয়নি। তাই সে টেবিলের সামনে থেকে, চেয়ারখানা আলমারির সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে উঠে দাঁড়িয়ে নোটগুলো হস্তগত করে। তারপর তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে তার গায়ের ধাক্কা লেগে চেয়ারখানা উলটে পড়ে যায়। এ ব্যাপারটা গোড়াতেই আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। এদিকে আপনারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম। কিন্তু অধীনের কথা আপনি গ্রাহের মধ্যেও আনতে রাজি হননি।

অপ্রতিভ ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন হরিহর।

তিনকড়ি বললেন, বালক চোর? কী আশ্চর্য।

যদুবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, একটা পুঁচকে ছোকরা বিশ হাজার টাকা হাতিয়ে লম্বা দিয়েছে! আজব কাণ্ড!

মাধববাবু বললেন, কালে কালে হল কী?

।। সাত ।।

জয়ন্ত বললে, হরিহরবাবু, এই জুতো পরা পায়ের ছাপের আর-একটা বিশেষত্ব লক্ষ করুন। চোর যে জুতো পরে এখানে এসেছিল, তার ডান পাটির তলায় বাঁ-দিকের উপর কোণের চামড়ার খানিকটা চাকলা উঠে গিয়েছে। এই দেখুন, প্রত্যেক ডান পায়ের ছাপেই তার স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

হরিহরের মুখের উপর থেকে মুরুব্বিয়ানার ভাব মিলিয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, তাই তো বটে, তাই তো বটে! তাকে পেলে তার বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে আর কোনও কষ্ট হবে। না। তারপরেই একটু থেমে, মুষড়ে পড়ে তিনি আবার বললেন, কিন্তু তাকে আর পাব কি?

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, চোর নিজেই আমাদের কাছে এসে ধরা দেবে। হরিহর সচমকে শুধোলেন, কী বললেন?

—চোরের খোঁজ আমি পেয়েছি।

-কোথায়, কোথায়?

—এইদিকে একটু এগিয়ে আসুন। এই পায়ের ছাপগুলো দেখে কী বুঝছেন?

—এও তো চোরেরই পায়ের ছাপ।

–কোনও তফাত নেই তো?

ভালো করে দেখে সন্দিগ্ধ স্বরে হরিহর বললেন, মনে হচ্ছে এ ছাপ যেন টাটকা।

জয়ন্ত বললে, ঠিক তাই। এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে এইমাত্র। নির্বোধ চোর খেয়ালে আনেনি, কাল রাতের বিষম বৃষ্টির জন্যে মাটি এখনও ভিজে আছে।...আরে, আরে যদুবাবু, খরগোশের মতো দৌড়ে কোথা যান? মানিক, হুঁশিয়ার!

সকলে বিপুল বিস্ময়ে দেখলে, যদুবাবুর বামনাবতারের মতো অতিখর্ব দেহখানি দৌড় মেরেছে তীব্র বেগে বাঁশের বেড়ার দিকে। কিন্তু বেড়া টপকাবার আগেই মানিক তাকে ছুটে গিয়ে গ্রেপ্তার করে ফেললে।

তিনকড়ি বিস্মিত স্বরে বললেন, যদু, তুমি কার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে?

জয়ন্ত বললে, পুলিশের ভয়ে। এখনই ওঁর বাড়ি খানাতল্লাশ করলে আপনার বিশ হাজার টাকার সন্ধান পাওয়া যাবে।

তিনকড়ি এ কথা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না, ফ্যালফ্যাল করে যদুবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন।

জয়ন্ত বললে, যখন চেয়ারের রহস্য আন্দাজ করলুম, পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করলুম, আর স্বচক্ষে যদুবাবুর বালকের মতো খাটো মূর্তিখানি দর্শন করলুম, তখনই জেগে উঠেছিল আমার সন্দেহ। ওঁর আর তিনকড়িবাবুর সামনাসামনি বাড়ি। তিনকড়িবাবু যে বাড়িতে বিশ হাজার টাকা এনে রেখেছেন, ওঁর পক্ষে একথা জানা খুবই স্বাভাবিক। ওঁর বন্ধু যখন মাঝে মাঝে আলমারির ভিতর থেকে নোটগুলো বার করতেন, তখন সে দৃশ্য তিনি যে নিজের বাড়ি থেকেই দেখতে পেতেন, এইটুকুও অনুমান করা যায় খুবই

সহজেই। বৈঠকখানায় ছিল তার নিয়মিত আসা-যাওয়া। আলমারির কলের ছাঁচ তোলবার অবসর পেতে পারেন উনিই। সুতরাং অধিক বলা বাহুল্য। তবে এ কথা ঠিক যে, নিম্নশ্রেণির নির্বোধের মতো আজ যেচে ভিজে মাটি মাড়িয়ে উনি যদি আমার ফাঁদে পা না দিতেন, তাহলে এত তাড়াতাড়ি ওঁকে হরিহরবাবুর কবলে আত্মসমর্পণ করতে হত না।

হ্যাঁ, ভালো কথা। যদুবাবুর ডানপাটির জুতোর তলাটা একবার পরীক্ষা করে দেখলে ভালো হয়।

পরীক্ষার ফল হল সন্তোষজনক। জুতোর তলায় যথাস্থানে ছিড়ে গিয়েছে খানিকটা চামড়া।

জয়ন্ত বললে, মানিক, এখন শেষকৃত্যের ভার পুলিশের হাতে সমর্পণ করে চলো আমরা এখান থেকে প্রস্থান করি। কিন্তু যাবার আগে একটি জিজ্ঞাস্য আছে। হরিহরবাবু, শখের গোয়েন্দারা কি একেবারেই ঘৃণ্য জীব?

হরিহর অনুতপ্ত স্বরে বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন। আজ আমার চোখ ফুটল।